





এক

বহুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল, পাখা দেয় নাই বিধি।
— রাখালী গান

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও — মধ্যে ধু ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।
এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গাঁয়ে ঘেম জমাট বেঁধে বনের কাজল-কায়া,
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় ঘরের মায়া।

এ-গাঁও যেন ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,
কতদিন যে কাটবে এমন, কেইবা তাহা জানে।
মাঝখানেতে জলীর বিলে জলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল-কুমুদী মেলছে শতদল।
এ-গাঁর ও-গাঁর দুধার হতে পথ দুখানি এসে,
জলীর বিলের জলে তারা পদ্ম ভাসায় হেসে।
কেউবা বলে—আদিকালের এই গাঁর এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমে গলায় পরে ফাঁসি;
এ-পথ দিয়ে একলা মনে চলছিল ওই গাঁয়ে,
ও-গাঁর মেয়ে আসছিল সে নুপুর-পরা পায়ে।

এই ঝানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হয়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়।
কেইবা জানে হয়ত তাদের মালা হতেই খসি,
শাপলা-লতা খেলছে পরাগ জলের উপর বসি।

মাঠের মাঝে জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ,
জ্বলছে যেন এ-গাঁও ও-গাঁও বিরহের দীপ।
বুকে তাহার এ-গাঁও ও-গাঁও হরেক রঙের পাখি,
মিলায় সেখা নূতন জগৎ নানান সুরে ডাকি।
সন্ধ্যা হলে এ-গাঁও পাখি এ-গাঁও পানে ধায়,
ও-গাঁও পাখি এ-গাঁও আসে বনের কাজল-ছায়।
এ-গাঁও লোকে নাইতে আসে, ও-গাঁও লোকও আসে
জলীর বিলের জলে তারা জলের খেলায় ভাসে।

এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দূর — শুধুই জলের ডাক,
তবু যেন এ-গাঁও ও-গাঁও নাইক কোন ফাঁক।
ও-গাঁও বধু ঘটি ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন কখন দোলা তাহার এ-গাঁও এসে লাগে।
এ-গাঁও চাষী নিম্ন রাত্রে বাঁশের বাঁশীর সুরে,
ওইনা গায়ের মেয়ের সাথে গহন বাঁধায় ঝুরে !
এগাঁও হতে ভাটীর সুরে কাদে যখন গান,
ও-গাঁও মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে;
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।

এ-গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে,
 কাইজা^১ ফ্যাসাদ^২ করেছে যা জানেই জানে জানে।
 এ-গাঁর লোকও করতে পরখ ও গাঁর লোকের বল,
 অনেক বারই লাগ করেছে জলীর বিলের জল।
 তবুও ভাল, এ-গাঁও, ও-গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ,
 মাঝখানে তার ধুলায় দোলে দুখান দীঘল বাট;
 দুই পাশে তার খান-কাউনের অধই রঙের মেলা,
 এ-গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি ও-গাঁয় যাওয়ার ভেলা।

দুই

এক কালো দাতের কালি যা দ্যা কলম লেখি,
 আর এক কালো চকের মণি, যা দ্যা দৈনা দেখি,
 — ও কালো, ঘরে রইতে দিলি না আমারে।

— মুরশিদ গান

এই গায়ের এক চামার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
 কালো মুখেই কালো ড্রাম, কিসের রঙিন ফুল !
 কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,
 তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন ত্বকের ছায়া।
 জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
 গা খানি তার শাউন মাসের যেমন তমাল তরু।
 বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল,
 বিজলী মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
 কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষী,
 মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
 কালো দাতের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
 জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
 চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

১। কাইজা = মারামারি ২। ফ্যাসাদ = ঝগড়া



সোনায়ে যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার'
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধণ্ডকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদ-রঞ্জের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি খান, যে কালো তার গাঁও।
সেই কালোতে সিনানু করি উজ্জল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলায় দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
“শাল-সুন্দী-বেত” যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল^১ লোহা যেন,
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন ?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।

১. পাগাল = ইম্পাত

তিন

চন্দনের বিন্দু বিশ্ব কাজলের ফোঁটা

কাশিয়া মেঘের আড়ে বিকসীপ্ত ছটা

— মুর্শিদা গান

ওই গাখানি কাপো কালো, তারি হেলান দিয়ে,
ঘরখানি যে দাঁড়িয়ে হাসে ছোনের ছানি নিয়ে;
সেইখানি এক চাষীর মেয়ে নামটি তাহার সোনা,
সাজু^১ বলেই ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা^২।
লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,
ভোরের হাওয়া যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি।
মুখখানি তার চললে চলেই যেত পড়ে,
রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে।
ফুল ঝর-ঝর জন্তি গাছে জড়িয়ে কেবা শাড়ী,
আদর করে রেখেছে আজ চাষীদের ওই বাড়ী।
যে ফুল ফোটে সোনের খেতে, ফোটে কদম গাছে,
সকল ফুলের ঝলমল গা-ভরি তার নাচে।

১। সাজু = পৃথিবীর কোনো কোনো জেলায় বাপের বাড়িতে মুসলমান মেয়েদের নাম
ধরিয়া ডাকা হয় না। বড় মেয়েকে বড়, মেঝ মেয়েকে মাঝ, সের মেয়েকে সাজু
এইভাবে ডাকে। শূরবাড়ির লোকে কিন্তু এ নামে ডাকিতে পারে না।

২। গোনা = পাণ

কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনার সোনার খেলা,
তুলসী-তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।
গাঁদাফুলের রঙ দেখেছি, আর যে চাঁপার কলি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে আজ তাই কেমনে বলি ?
রামধনুকে না দেখিলে কি-ই বা ছিল ক্ষোভ,
পাটের বনের বউ-টুবাণী^১, নাইক দেখার লোভ।
দেখেছি এই চাষীর মেয়ের সহজ গোঁয়ো রূপ,
তুলসী-ফুলের মঞ্জরী কি দেব-দেউলের ধূপ।
দু-একখানা গয়না গায়ে, সোনার দেবালয়ে,
জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার বা পূজা ব্যয়ে !
পড়শীরা কয় — মেয়ে ত নয়, হলদে পাখির ছা,
ডানা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।

এমন মেয়ে — বাবা ত নেই, কেবল আছেন মা;
গাঁওবাসীরা তাই বলে তায় কম জানিত না।
তাহার মতন চেকন 'সেওই' কে কাটিতে পারে,
নকসী করা 'পাকান পিঠায়' সবাই তারে হারে।
ইাড়ির উপর চিত্র করা শিক্যে তোলা ফুল,
এই গায়েতে তাহার মত নাইক সমতুল।
বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে,
“সাজু গায়ের লক্ষী মেয়ে” — বলে কি লোক সাথে ?

১। বউ টুবাণী = মাঠের ফুল

চার

কানা দেয়ারে, তুই না আমার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক^১ দে, চিনার ভাত খাই।

— মেঘরাজার গান

চৈত্র গেল ত্রীষণ খরায়^২, বোশেখ রোদে ফাটে,
এক ফোঁটা জল মেঘ চোয়ায়ে নামল না গাঁর বাটে।
ডোলের বেছন^৩ ডোলে চাষীর, বয় না গরু হালে,
লাঙল জোয়ালা ধুলায় পুটার মরচা ধরে ফালে।
কাঠ-কাটা রোদ যাঁঠ বাটা বাট আগুন লয়ে খেলে,
বাউকুড়াণী^৪ উড়ছে তারি ঘূর্ণি ধূলি মেলে।
মাঠখানি আঁজ শুনো খী খী, পথ যেতে দম আঁটে,
জন্-মানবের নাইক সাড়া কোথাও মাঠের বাটে;
শুকনো চেলা কাঠের মত শুকনো মাঠের ঢেপা,
আগুন পেলেই জ্বলবে সেখায় জাহান্নামের^৫ খেলা।
দহুগা তলা দুহুে ভাসে, সিন্ধী আসে ভারে;
নৈলা গানের^৬ ঝঙ্কারে গাঁও কানুছে বারে বারে।
তবুও গায়ে নামল না জল, গগনখানা ফাঁকা;
নিঠুর নীলের বন্ধে আগুন করছে যেন খী খী।

১। ডলক = বৃষ্টি। ২। খরায় = গরমে। ৩। বেছন = বীজ।

৪। বাউকুড়াণী = ঘূর্ণিবায়ু। ৫। জাহান্নাম = নরক।

৬। নৈলা গান = বৃষ্টি নামাইবার জন্য চাষীরা এই গান গাহিয়া থাকে।

উকে ডাকে বাজপক্ষি 'আজরাইলে'র ডাক,
'বর-দরজাল'^১ আসছে বুঝি শিড়ায় দিয়ে হাঁক ।

এমন সময় ওই গাঁ হতে বদনা-বিয়ের গানে,
গুটি কয়েক আসল মেয়ে এই না গায়ের পানে ।
আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে পাঁচটি রঙে ফুল,
মাকের মেয়ে সোনার বরণ, নাই কোথা তার তুল ।
মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল,
ডেল-হলুদে কানায় কানায় করেছে ছপাং ছল ।
মেয়ের দলে বেড়িয়ে তারে চিকন সুরের গানে,
গায়ের পথে যায় যে বলে বদনা-বিয়ের মানে ।
ছেলের দলে পড়ল মাড়া, বউরা মিঠে হাসে,
বদনা-বিয়ের গান শুনতে সবাই ছুটে আসে ।
পাঁচটি মেয়ের মাকের মেয়ে লাগে যে যায় মরি,
বদনা হতে ছপাং ছপাং জল যেতে চায় পড়ি ।
এ-বাড়ি যায় ও-বাড়ি যায়, গানে মুখর গাঁ,
ঝাকে ঝাকে উড়ছে যেন রাম-শালিকের ছা ।

কালো মেঘা নামো নামো, ফুল-তোলা মেঘ নামো,
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সব ঘামো !
কানা মেঘা, টলমল বারো মেঘার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই !

১। বর-দরজাল=প্রশ্নের দিনে ইনি বেহেত ও দোখ মাথায় করিয়া
আসিবেন। বড়ো দরজাল ।

কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া ।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাজি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি ।
কৌটো ভরা সিদুর দিব, সিদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায় ।

দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো ।
দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো ।
ঘরের লাঙল ঘরে রইল, হাইল্যা চাবা রইদি মইল;
দেয়ারে তুমি অরিশাল বদনে চপিয়া পড় ।
ঘরের গরু ঘরে রইল, জোশের বেহন ডোলে রইল;
দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো ।

বারো মেঘের নামে নামে এমনি ডাকি ডাকি,
বাড়ি বাড়ি চলল তারা মাঙন হাঁকি হাঁকি ।
কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাকখানি,
কেউ দিল নুন, কেউ দিল ডাল, কেউবা দিল আনি ।
এমনি ভাবে সবার ঘরে মাঙন করি সারা,
রুপাই মিঞার রুশাই-ঘরের^১ সামনে এল তারা ।
রুপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়,
পাঁচটি মেয়ের রূপ বুঝি ওই একটি মেয়ের গায় ।
পাঁচটি মেয়ে, গান যে গায়, গানের মতই লাগে,
একটি মেয়ের সুর ত নয় ও বাঁশী বাজায় আগে ।

১। রুশাই-ঘরের=রন্ধন শালায়

ওই মেয়েটির গঠন-গঠন চলন-চালন ভালো,
পাঁচটি মেয়ের রূপ হয়েছে ওরির রূপে আলো।

রূপাইর মা দিলেন এনে সেরেক খানেক খান,
রূপাই বলে, “এই দিলে মা থাকবে না আর মান।”
ঘর হতে সে এনে দিল সেরেক পাঁচেক চাল,
সেরেক খানেক দিল মেপে সোনা মুগের ডাল।
মাঙন সেরে মেয়ের দল চলল এখন বাড়ি,
মাঝের মেয়ের মাথার বোঝা লাগছে যেন ভারি।
বোঝার ভারে চলতে নারে, পিছন ফিরে চায় ;
রূপার দুচোখ বিধিল গিয়ে সোনার চোখে হয়ে।

পাঁচ

লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৈবন

— ময়মনসিংহ গীতিকার

আগ্নিনেতে ঝড় হাঁকিল, বাণ ডাকিল জোরে,
গ্রামভরা-ভর ছুটল ঝাপট লুপট সব করে।
রূপার বাড়ির রুশাই-ঘরের ছুটল চালের ছানি,
গোয়াল ঘরের খাম^১ থুয়ে তার চাল যে নিল টানি।

ওগার বাঁশ দশটা টাকায়, সে গায় টাকায় তেরো,
মধ্যে আছে জলীর বিল কিইবা তাহে গেরো^২।
বাঁশ কাটিতে চল্ল রূপাই কোঁচায় বেঁধে চিড়া,
দুপুর বেলায় খায় যেন সে—মায় দিয়াছে কিরা।
মাজায় শোজা রাম-কাটারী চক্চকচক্ ধার,
কোঁধে রঙিন গামছাবানি দুলছে যেন হার।

মোল্লা-বাড়ির বাঁশ ভাল, তার ফাঁপগুলি নয় বড়;
খাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।
সর্বশেষে পছন্দ হয় শেষের বাড়ির বাঁশ;
ফাঁপগুলি তার কাঠের মত, চেকন-চোকন আঁশ।

১। খাম = থাম ২। গেরো=বাঁধ

বাঁশ কাটিতে যেয়ে রূপাই মারল বাঁশে দা,
তল দিয়ে যায় কাদের মেয়ে—হলদে পাখির ছা।
বাঁশ কাটিতে বাঁশের আগায় লাগল বাঁশের বাড়ি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে তার প্রাণ বৃদ্ধি যায় ছাড়ি।
লম্বা বাঁশের লম্বা যে ফাঁপ, আগায় বসে টিয়া,
চাষীদের ওই সোনার মেয়ে কে করিবে বিয়া।
বাঁশ কাটিতে এসে রূপাই কাটল বুকের চাম,
বাঁশের গায়ে বসে রূপাই তুলল নিজের কাম।
ওই মেয়ে ত তাদের গায়ে বদনা-বিয়ের গানে,
নিয়েছিল প্রাণ কেড়ে তার চিকন সুরের দানে।

“খড়ি^১ কুড়াও সোনার মেয়ে! শুকনো গাছের ডাল,
শুকনো আমার প্রাণ নিয়ে যাও, দিও আখার জ্বাল।
শুকনো খড়ি কুড়াও মেয়ে! কোমল হাতে লাগে,
তোমায় যারা পঠায় বনে বোঝেনি কেন আগে?”
এমনিভর কত কথাই উঠে রূপার মনে,
লজ্জাতে সে হয় যে রঙিন পাছে বা কেউ শোনে।
মেয়েটিও ভাগর চোখে চেয়ে তাহার পানে,
কি কথা সে ভাবল মনে সেই জানে তার মানে।

এমন সময় পিছন হতে তাহার মায়ে ডাকে,
“ওলো সাজু! আয় দেখি তোর নথ বেঁধে দেই নাকে!
ওমা! ও'কে বেগান^২ মানুষ বসে বাঁশের ঝাড়ু।”
মাখায় দিয়ে ঘোমটা টানি দেখছে বারে বারে।

১। খড়ি = জ্বালানী কাঠ।

২। বেগান=পর।

খানিক পরে ঘোমটা খুলে হাসিয়া এক গাল,
বলল, “ও কে, রূপাই নাকি ? বাঁচবি বহু কাল !
আমি যে তোর হইরে খালা^১, জানিসনে তুই বুঝি ?
মোত্তা-বাড়ির বড়ুরে তোর মার কাছে নিস খুঁজি ।
তোর মা আমার খেলার দোসর — যাক্গে ওসব কথা,
এই দুপুরে বাঁশ কাটিয়া খাবি এখন কোথা ?”

রূপাই বলে, “মা দিয়েছেন কোঁচায় বেঁধে চিড়া”
“ওমা ! ও তুই বলিস কিরে ? মুখখানা তোর ফিরা ।
আমি হেথা থাকতে খালা, তুই থাকবি ভুবে,
শুনলে পরে তোর মা মোরে দুধবে কত রুখে !
ও সাজু, তুই বড় মোরগ ধরগে যেয়ে বাড়ি,
ওই গা হতে আমি এদিক দুধ আনি এক হাড়ি ।”

চলল সাজু বাড়ির দিকে, মা গেল ওই পাড়া ।
বাঁশ কাটিতে রূপাই এদিক মারল বাঁশে নাড়া ।
বাঁশ কাটিতে রূপার বুকে ফেটে বেরোয় গান,
নলী বাঁশের বাঁশীতে কে মারছে যেন টান ।
বেছে বেছে কাটল রূপাই ওড়া-বাঁশের গোড়া,
তপ্পা-বাঁশের কাটল আগা, কালধোয়ানির জোড়া;
বাল্কে কাটে আল্কে কাটে কঙ্কি কাটে শত,
ওদিক বসে রূপার খালা রাস্তে মনের মত ।

১। খালা=মাসী

সাজু ডাকে তলা থেকে, “রূপা-ভাইগো এসো”
—এই কথাটি বলতে তাহার লজ্জারো নাই শেষও ।
লাজের ডারে হয়তো মেয়ে যেতেই পারে পড়ে,
রূপাই ভাবে হাত দুখানি হঠাৎ যেয়ে ধরে ।

ছয়

ও তুই ঘরে রইতে দিলি না আমারে ।

— রাখালী গান

যাহোক রূপাই বাঁশ কাটিয়া এল খালার বাড়ি,
বসতে তারে দিলেন খালা শীতল পাটি পাড়ি ।
বদনা ভরা জল দিয়ে আর খড়ম দিল মেলে,
পাও দুখানি ধুয়ে রূপাই বসল বামে হেলে ।
খেতে খেতে রূপাই কেবল খালার তারিফ করে,
“অনেক দিনই এমন ছাপুন^১ খাইনি কারো ঘরে ।”
খালায় বলে “আমি ত নয় রেখেছে তোর বোনে,”
লাজের সাজুর ইচ্ছা করে লুকায় আঁচল-কোণে ।
এমনি নানা কথায় রূপার আহার হল সারা,
সন্ধ্যা বেলায় চলল ঘরে মাথায় বাঁশের ভাড়া ।

খালার বাড়ির এত খাওয়া, তবুও তার মুখ,
দেখলে মনে হয় যে সেখা অনেক লেখা দুখ ।
ঘরে যখন ফিরল রূপা লাগল তাহার মনে,
কি যেন তার হয়েছে আজ বাঁশ কাটিতে বনে ।
মা বলিল, “বাছারে, কেন মলিন মুখে চাও?”
রূপাই কহে, “বাঁশ কাটিতে হারিয়ে এলেম দাও^২ ।”

ঘরেতে রূপার মন টেকে না যে, তরলা বাঁশীর পারা,
কোন বাতাসেতে ভেসে যেতে চায় হইয়া আপন হারা ।
কে যেন তাহার মনের তরীয়ে ডাটির করুণ তানে,
ডাটিয়াল সোতে ভাসাইয়া নেয় কোন্ সে ডাটার পানে ।
সেই চিরকালে গান আজও গাহে, সুরখানি তার ধরি,
বিগানা গায়ের বিরহিয়া মেয়ে বেয়ে আসে যেন তরী ।
আপনার গানে আপনার প্রাণ ছিড়িয়া যাইতে চায়,
তবু সেই ব্যথা ভাল লাগে যেন, একই গান পুনঃ গায় ।
খেত-খামারে মন বসেনাকো; কাজে কামে নাই ছিরি,
মনের তাহার কি যে হল আজ ভাবে তাই ফিরি ফিরি ।
গানের আসরে যায় না রূপাই সাথীরা অবাক মানে,
সারাদিন বসি কি যে ভাবে তার অর্থ সে নিজে জানে ।
সময়ের খাওয়া অসময়ে খায়, উপোসীও কতু থাকে,
“দিন দিন তোর কি হল রূপাই” বার বার মায় ডাকে ।
গেলে কোনখানে হয়ত সেখাই কেটে যায় সারাদিন,
বসিলে উঠেনা উঠিলে বসেনা, ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ ।
সবে হাটে যায় পথ বরাবর রূপা যায় ঘুরে বাঁকা,
খালার বাড়ির কাছ দিয়ে পথ, বাঁশ-পাতা দিয়ে ঢাকা ।

১। ছাপুন = তরকারী ।

২। দাও = দা ।

পায়ে-পায় ছাই বাঁশ-পাতাগুলো মচ্ মচ্ করে বাজে;
কেউ সাথে নেই, তবু যে রূপাই মরে যায় যেন লাজে।
চোরের মতন পথে যেতে যেতে এসিক ওদিক চায়,
যদিবা হঠাৎ সেই মেয়েটির দুটি চোখে চোখ যায়।
ফিরিবার পথে খালার বাড়ির নিকটে আসিয়া তার,
কত কান্না পড়ে, কি করে রূপাই দেরি না করিয়া অর।

কোনদিন কহে, “খালামা, তোমার জ্বর নাকি হইয়াছে,
ও-বাড়ির ওই কানাই আজিকে বলেছে আমার কাছে।
বাজার হইতে আনিয়াছি তাই আধসেরখানি গজা;”
“বালাই ! বালাই ! জ্বর হবে কেন ? রূপাই করিলি মজা;
জ্বর হলে কিরে গজা খায় কহে ?” হেসে কয় তার খালা,
“গজা খায়নাক, যা হোক এখন কিনে ত হইল জ্বালা;
আল্লা না হয় সাজুই খাইবে।” ঠেকে ঠেকে রূপা কহে,
সাজু যে তখন লাজে মরে যায়, মাথা নীচু করে রহে।

কোন দিন কহে, “সাজু কই ওরে, শোনো কিবা মজা, খালা !
আজকের হাটে কুড়ায়ে পেয়েছি দুগাছি পুঁতির মালা;
এক ছোঁড়া কয়, ‘রাঙা সূতো’ নেবে ? লাগিবে না কোন দাম;
নিলে কিবা ক্ষতি, এই ডেবে আমি হাত পেতে লইলাম।
এখন ভাবছি, এসব লইয়া কিবা হবে মোর কাজ,
ঘরেতে থাকিলে ছোট বোনটি সে ইহাতে করিত সাজ।
সাজু ত আমার বোনেরই মতন, তারেই না দিয়ে যাই,
ঘরে ফিরে যেতে একটু ঘুরিয়া এ-পথে আইনু তাই।”

এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে দুইটি অরুণ হিয়া,
এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনে-সুতী মালা দিয়া।

এর প্রাণ হতে ওর প্রাণে যেয়ে লাগিল কিসের ঢেউ,
বিভোল কুমার, বিভোল কুমারী, তারা বুঝিল না কেউ।
—তারা বুঝল না, পাড়ার লোকেরা বুঝিল অনেকখানি,
এখানে ওখানে ছেলে বুড়ো মিলে শুরু হল কানাকানি।

সেদিন রূপাই হাট-ফেরা পথে আসিল খালার বাড়ি,
খালা তার আজ কথা কয়নাক, মুখখানি যেন হাঁড়ি।
“রূপা ভাই এলে ?” এই বলে সাজু কাছে আসছিল তাই,
মায় কয়, “ওরে ধাড়ী মেয়ে, তোর লজ্জা শরম নাই ?”
চুল ধরে তারে গুড়ুম গুড়ুম মারিল দু’তিন কিল,
বুঝিল রূপাই এই পথে কোন হইয়াছে গরমিল।

মাথার বোঝাটি না-নামায়ে রূপা যেতেছিল পথ ধরি,
সাজুর মায়ে যে ডাকিল তাহারে হাতের ইশারা করি;
“শোন বাছা কই, লোকের মুখেতে এমন ভেমন শুনি,
ঘরে আছে মোর বাড়ন্ত মেয়ে জ্বলন্ত এ আগুনি।
তুমি বাপু আর এ-বাড়ি এসো না।” খালা বলে রোষে রোষে,
“কে কি বলে ? তার ঘাড় ভেঙে-দেব !” রূপা কহে দম কসে।
“ও-সবে আমার কাজ নাই বাপু, সোজা কথা ভালবাসি,
সারা গায়ে আজ টি টি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুল-নাশী।”

সাজুর মায়ের কথাগুলি যেন বঁড়লীর মত বাঁকা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে দিয়ে যায় তীব্র বিষের ধাকা।
কে যেন বাঁশের জোড়-কঙ্কিতে তাহার কোমল পিঠে,
মহারোষ-ভরে সপাং সপাং বাড়ি দিল গিঠে গিঠে।
টলিতে টলিতে চলিল রূপাই একা গাঁর পথ ধরি,
সম্মুখ হতে জোনাকীর আলো দুই পাশে যায় সরি।

রাতের আঁধার গলি ভরা বিষে জমাট বেঁধেছে বুঝি,
দুই হাতে তাহা ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলে রূপা পথ খুঁজি।
মাথার ধামায় এখনও রয়েছে দুকোড়া রেশমী চুড়ি,
দুপায়ে তাহারে দলিয়া রূপাই ভাঙিয়া করিল গুঁড়ি।
হাটের সদাই^১ জঙ্গীর বিলেতে দুহাতে ছুঁড়িয়া ফেলি,
পথ ধরে রূপা বেপথে চলিল, ইটা খেতে^২ পাও মেলি।
চলিয়া চলিয়া মধ্য মাঠেতে বসিয়া কাঁদিল কত,
অষ্টমী চাঁদ হেলিয়া হেলিয়া ওপারে হইল গত।

প্রভাতে রূপাই উঠিল যখন মায়ের বিছানা হতে,
চেহারা তাহার আধা হয়ে গেছে চেনা যায় কোন মতে।
মা বলে, “রূপাই কি হলরে তোর?” রূপাই কহে না কথা
দুখিনী মায়ের পরাণে আজিকে উঠিল দ্বিগুণ ব্যথা।
সাত নয় মার পাঁচ নয় এক রূপাই নয়ন তারা,
এমনি তাহার দশা দেখে মায় ভাবিয়া হইল সারা।
শানাল^৩ পীরের সিন্ধি মানিল খেতে দিল পড়া-পানি,
দেহের দৈন্য দেখিল জননী, দেখিল না প্রাণখানি।
সারা গায়ে মাতা হাত বুলাইল চোখে-মুখে দিল জল,
বুঝিল না মাতা বুকের ব্যথার বাড়ে যে ইহাতে বল।

আজকে রূপার সকলি আঁধার, বাড়া-ভাতে ওড়ে ছাই,
কলঙ্ক কথা সবে জানিয়াছে, কেহ বুঝি বাকি নাই।
জেনেছে আকাশ; জেনেছে বাতাস, জেনেছে বনের তরু;
উদাস-দৃষ্টি যত দিকে চাহে সব যেন শূন্যে মরু।

১। সদাই=সজদা। ২। ইটা খেতে=চষা খেতে।

৩। শানাল=পূর্ব বঙ্গের বিখ্যাত পীর শাহমাল।

চারিদিক হতে উঠিতেছে সুর, ধিকার । ধিকার ।।
 শাখের করাত কাটিতেছে তারে লয়ে কলঙ্ক ধার ।
 ব্যথায় ব্যথায় দিন কেটে গেল, আসিল ব্যথার সাজ,
 পূবে কলঙ্কী কালো রাত এল, চরণে ঝিঝির বাঁজ ।
 অনেক সুখের দুখের সাক্ষী বাঁশের বাঁশীটি নিয়ে,
 বসিল রূপাই বাড়ির সামনে মধ্য মাঠেতে গিয়ে ।

মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি ?
 মিছেই যোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ বুঝি ।
 আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায়;
 যে লেখে বেদনা বে-বুঝ বাঁশীতে কেমন দেখাব তার ?
 অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে,
 এ দেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখের ভাষায় টুকে;
 সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানাব ? তবুও মাটিতে কান;
 পেতে রহি যদি কড়ু শোনা যায় কি কহে মাটির প্রাণ ।
 মোরা জানি খোজ বৃন্দাবনেতে ভগবান করে খেলা,
 রাজা-বাদশার সুখ-দুঃখ দিয়ে গড়েছি কথার মেলা ।
 পল্লীর কোলে নির্বাসিত এ ভাইবোনগুলো হয়,
 যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায়;
 তাহাদেরই এক বিরহিয়া বুকে কি ব্যথা দিতেছে দোল,
 কি করিয়া আমি দেখাইব তাহা, কোথা পাব সেই বোল ?
 —সে বন-বিরহ কাদিতে জানে না, বেদনার ভাষা নাই,
 ব্যাধের শায়ক বুকে বিধিয়াছে জানে তার বেদনাই ।

বাজায় রূপাই বাঁশীটি বাজায় মনের মতন করে,
 যে ব্যথা বুকে ধরিতে পারেনি সে ব্যথা বাঁশীতে করে ।

‘আমি কেনে বা গিরীতিরে করলাম ।
 (আমার ভাবতে জনম গেলরে,
 আমার কানতে জনম গেলরে ।)

সে ত সীতার সিন্দুর নয় তারে আমি কপালে পরিব,
 সে ত ধান নয় চাউল নয় তারে আমি ডোলেতে তরিবরে,
 আমি কেনেবা গিরীতিরে করলাম ।
 আগে যদি জানতাম আমি শ্রমের এত জ্বালা,
 ঘর করতাম কদরতলা, রহিতাম একেলারে;
 আমি কেনেবা গিরীতিরে করলাম ।’

— মুর্শিদা গান

বাজে বাঁশী বাজে, তারি সাথে সাথে দুলিছে সাজের আলো;
 নাচে তালে তালে জোনাকীর হারে কালো মেঘে রাত-কালো ।
 বাজাইল বাঁশী ভাটিয়াসী সুরে বাজাল উদাস সুরে,
 সুর হতে সুর ব্যথা তার যেন চলে যায় কোন্ দূরে !
 আপনার ভাবে বিভোল পরাণ, অনন্ত মেঘ-লোকে,
 বাঁশী হতে সুরে গুণে যায় যেন, দেখে রূপা দুই চোখে ।
 সেই সুর বেয়ে চলেছে তরুণী, আউলা মাথার চুল,
 শিখিল দুখান বাহ বাড়াইয়া ছিড়িছে মালার ফুল ।
 রাজা ভাল হতে যতই মুছিছে ততই সিঁদুর জ্বলে;
 কখনও সে মেয়ে আগে আগে চলে, কখনও বা পাছে চলে !
 খানিক চলিয়া থামিল তরুণী আঁচলে ঢাকিয়া চোখ,
 মুছিতে মুছিতে মুছিতে পারে না, কি যেন অসহ শোক ।
 করুণ তাহার করুণ কান্না আকাশ ছাইয়া যায়,
 কি যেন মোহের রক্ত ভাসে মেঘে তাহার বেদন-ঘায় ।

পুনরায় যেন ঝিলঝিল করে একগাল হাসি হাসে,
 তারি চেউ লাগি গগনে গগনে তড়িতের রেখা ভাসে ।

কখনও আকাশ ভীষণ আঁধার, সব গ্রাসিয়াছে রাহু,
 মহাশূন্যের মাঝে ভেসে উঠে যেন দুইখানি বাহু !
 দোলে — দোলে বাহু তারি সাথে যেন দোলে — দোলে কত কথা,
 “ঘরে ফিরে যাও মোর তরে তুমি সহিও না আর ব্যথা।”
 মুহূর্ত পরে সেই বাহু যেন শূন্যে মিলায় যায় —
 রামধনু বেয়ে কে আসে ও মেয়ে, দেখে যেন চেনা যায় !
 হাসি হাসি মুখ গলিয়া গলিয়া হাসি যায় যেন পড়ে,
 সারা গায়ে তার রূপ ধরেনাক, পড়িছে আঁচল ঝরে।
 কণ্ঠে তাহার মালার গঞ্জে বাতাস পাগল পারা,
 পায়ে রিনি ঝিনি সোনার নুপুর বাজিয়া হইছে সারা:

হঠাৎ কে এলো ভীষণ দস্যু—ধরি তার চুল মুঠি,
 কোন্ আঁকার গ্রহপথ বেয়ে শূন্যে সে গেল উঠি।
 বাঁশী কোলে দিয়ে ডাক ছেড়ে রূপা আকাশের পানে চায়,
 আধা চাঁদখানি পড়িছে হেলিয়া সাজুদের ওই গাঁয়।
 শূন্যে মাঠে রূপা গড়াগড়ি যায়, সারা গায়ে ধূলো মাখে,
 দেহেরে ঢাকিছে ধূলো মাটি দিয়ে, ব্যথারে কি দিয়ে ঢাকে !

সাত

‘ঘটক চলিল চলিল সূর্য সিংহের বাড়িরে।’

— আসমান সিংহের গান

কান্-কানা-কান্ ছুটল কথা গুন-গুনা-গুন তানে,
 শোন-শোনা-শোন্ সবাই শোনে, কিন্তু কানে কানে।
 “কি করগো রূপার মাতা ? খাইছ কানের মাথা ?
 ও-দিক যে তোর রূপার নামে রটছে গাঁয়ে যা তা !
 আমরা বলি রূপাই এমন সোনার-কলি ছেলে,
 তার নামে হয় এমন কথা দেখব কি কাল গেলে ?”
 এই বলিয়া বড়াই বুড়ী বসল বেড়ি দোর,
 রূপার মা কয়, “বুঝিবে যেন কি তোর কথার ঘোর।”
 বুড়ী যেন আচমকা হয় আকাশ হতে পড়ে,
 “সবাই জানে তুই না জানিস যে কথা তোর ঘরে ?”
 ও-পাড়ার ও ভাগুর ছুঁড়ী, শেখের বাড়ির ‘সামু’,
 তারে নাকি তোর ছেলে সে গড়িয়ে দেছে বাজু।
 ঢাকাই শাড়ী কিনা দিছে, হাঁসলী দিছে নাকি,
 এত করে এখন কেন শাদীর রাখিস ব্যাকি ?”
 রূপার মা কয়, “রূপা আমার এক-রত্তি ছেলে,
 আজও তাহার মুখ শুকিলে দুধের ঘিরাণ মেলে।
 তার নামে যে এমন কথা রটায় গাঁয়ে গাঁয়ে,
 সে যেন তার বেটার মাথা ঢিকায় বাড়ি যায়ে।”

রূপার মায়ের রুঠা কথায় উঠল বুড়ীর কাশ,
 একটু দিলে তামাক পাতা, নিলেন বুড়ী স্বাস।
 এমন সময় ওই গা হতে আসল খেঁদির মাতা,
 টুনির ফুপু^১ আসল হাতে ডলতে তামাক পাতা।
 ক'জনকে আর ধামিয়ে রাখে? বুঝল রূপার মা;
 রূপা তাহার সতি করেই এতটুকু না।
 বুঝল মায়ে কেন ছেলে এমন উদাস পারা,
 হেথায় হোথায় কেবল ঘোরে হয়ে আপন হারা।
 ওপাড়ার ও দুখাই মিশ্রা ঘটকালিতে পাকা,
 সাজুর সাথেই জুড়ুক বিয়ে যতকে লাগুক টাকা।

শেখ বাড়িতে যেয়ে ঘটক বেকী-বেড়ার কাছে,
 দাঁড়িয়ে বলে, “সাজুর মাগো, একটু কথা আছে।”
 সাজুর মায়ে বসতে তারে এনে দিলেন পিড়ে,
 ডাকবা হুঁকা লাগিয়ে বলে, আস্তে টান ধীরে।”
 ঘটক বলে, ‘সাজুর মাগো মেয়ে তোমার বড়,
 বিয়ের বয়স হলো এখন ভাবনা কিছু কর।’
 সাজুর মা কয় “তোমরা আছ ময়-মুরকি ভাই,
 মেয়ে মানুষ অস্ত শত বুঝি কি আর ছাই!
 তোমরা যা কও ঠেলতে কি আর সাধা আছে মোর?”

ঘটক বলে, “এই ত কথা, লাগবে না আর খোর।
 ও-পাড়ার ও রূপারে ত চেনই তুমি বোন,
 তার সাথে দাও মেয়ের বিয়ে ঠিক করিয়ে মন।”
 সাজুর মা কয়, “জান ত ভাই। রটছে গায়ে যা জা,
 রূপার সাথে বিয়ে দিলে থাকবে না আর মাথা।”

১। ফুপু = পিসী, বাপের বোন।

ঘটক বলে, “কাঁটা দিয়েই তুলতে হবে কাঁটা,
 নিন্দা যারা করে তাদের পড়বে মুখে কাঁটা।
 রূপা ত আর নয় এ গীয়ে যেমন তেমন ছেলে,
 লক্ষীরে দেই বউ বানিয়ে অমন জামাই পেলে।”
 ঠোটে ঘটক কয় গো কথা ঠোটে-ভরাভর হাসে;
 সাজুর মায়ের পরাণ তারি জোয়ার-জলে ভাসে।
 “দশ খান্দা জমি রূপার, তিনটি গরু হালে,
 ধানের-বেড়ী ঠেকে তাহার বড় ঘরের চালে।
 সাজু তোমার মেয়ে যেমন, রূপাও ছেলে তেমন,
 সাত গেরামের ঘটক আমি জোড় দেখিনি এমন।”

তার পরেতে পাড়ল ঘটক রূপার কুলের কথা,
 রূপার দাদার নাম শূনে লোক কাঁপত কথা তথা।
 রূপার নানা সোয়েদ-ঘেঁষা, মিঞাই বলা যায় —
 কাজী বাড়ির প্যায়দা ছিল কাজল-তলার গায়।
 রূপার বাপের রাবত ঋতির গায়ের চৌকিদারে,
 আসেন বসেন মুখের কথা — গান বাজিত তারে।
 রূপার চাচা অহিমদী, নাম শোন নি তার ?
 ইংরেজী তার বোল শুনিলে সব মানিত হার।
 কথা ঘটক বলল এঁটে, বলল কখন টিলে,
 সাজুর মায়ে সবগুলি তার ফেলল যেন গিলে।

মুখ দেখে তার বুকল ঘটক — লাগছে ওষুধ হাড়ে,
 বলল “তোমার সাজুর বিয়া ঠিক কর এই বারে।”
 সাজুর মা কয়, “যা বোঝ ভাই, তোমরা গ্যা তাই কর,
 দেখো যেন কথার আবার হয় না নড়চড়।”

১। দাদা = ঠাকুরদাদা।

“আউ ছিছি !” ঘটক বলে, “শোনই কথা বোন,
 তোমার সাজুর বিয়া দিতে লাগবে কত পণ ?
 পোণে দিব কুড়ি দেড়েক বায়না দেব তেরো,
 চিনি সন্দেশ আগোড়-বাগোড় এই পে ধরো বারো।
 সবদ্যা^১ হল দুই কুড়ি এ নিতেই হবে বোন,
 চাইলে বেশী জামাইর তোমার বেজার হবে মন।”
 সাজুর মা কয়, “ও-সব কথার কি-ইবা আমি জানি,
 তোমরা যা কও তাইত খোদার শুকুর বলে আমি।”
 মাঝে বলে দুখাই ঘটক ঘটকালিতে পাকা,
 আদ্য মধ্য বিয়ের কথা সব করিল ফাঁকা।

চল-চলা-চল চলল দুখাই পথ বরাবর ধরি,
 তাগ-ধিনা-ধিন নাচে যেন গুনগুনা গান করি।
 দুখাই ঘটক নেচে চলে নাচে তাহার দাড়ি,
 বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি;
 লফে লফে চলে ঘটক দল করে চায়,
 লুটের মহল দখল করে চলছে যেন গায়।
 ঘটকালিরই টাকা যেন বন্-বন্-বন্ বাজে,
 হন্-হনা-হন্ চলল ঘটক একলা পথের মাঝে।
 ধানের জমি বাঁয় ফেলিয়া, ভাইনে ঘন পাট,
 জালীর বিলে নাও বাঁধিয়া ধল গায়ের বাট।
 “কি কর গো রূপার মাতা, ভাবছ বসি কিবা,
 সাজুর সাথেই ঠিক কইরাছি তোমার ছেলের বিবা^২।
 সহজে কি হয় সে রাজি, একশ টাকা পণ,
 এর কমেতে বসেইনাক সাজুর মায়ের মন।

১। সবদ্যা=সব দিয়া ২। বিবা=বিবাহ।

আমিও আবার কুড়ি তিনেক উঠিয়ে তার পরে,
সাজুর মায়ও নাছোড়-বান্দা, দিলাম তখন ধরে;
আরেক কুড়ি, তয়^১ সে কথা কইল হাসি হাসি,
আমি ভাবি, বিয়ার বুঝি বাজল সানাই বাঁশী।
এখন বলি, রূপার মাতা, আড়াই কুড়ি টাকা,
মোর কাছেতে দিবা, কথা হয় না যেন ফাঁকা !
আসব দিয়ে গোপনে তায়, নইলে গায়ের পোকে,
মেজবানী^২ দাও বলে তারে ধরবে চীনে-জোঁকে।
বিয়ের দিনে নিবে সে তাই তিরিশ টাকা যেচে,
যারে তারে বলতে পার এই কথাটি নেচে।
চিনি সন্দেশ আগোড় বাগোড় তার লাগিবে ষোলো,
এই ধরগ্যা রূপার বিয়া আজই যেন হল।”

রূপার মায়ের আহ্বানে প্রাণ ধরেইনাক আর,
ইচ্ছা করে নেচে নেচে বেড়ায় বারে বার।
“ও রূপা, তুই কোথায় গেলি ? ভাবিস্নাক মোটে,
কপাল গুণে বিয়ে যে তোর সাজুর সাথেই জোটে।”
এই বলিয়া রূপার মাতা ছুটল গায়ের পানে,
ঘটক গেল নিজের বাড়ি গুন-গুনা-গুন গানে।

১। তয়=তবে।

২। মেজবানী=নিমন্ত্রণ দেওয়া।

আট

“কি কর দুখ্যাপের মাপো; বিভাবনায় বসিয়া,
আসত্যাছে বেটীর দামান ফুল পাগড়ী উড়ায় নারে।”
“আসুক আসুক বেটীর দামান কিছুর চিন্তা নাইরে,
আমার দরজায় বিছায়া থুইছি কামরাজ্য পাটী নারে।
সেই ঘরেতে নাগায়া থুইছি মোমের সপ্ত^১ বাতি,
বাইর বাড়ি বান্দিয়া থুইছি গজমতী হাতী নারে।”

— মুসলমান মেয়েদের বিবাহের গান

বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ি,
কাছারী ঘর গুম-গুমা-গুম, লোক হয়েছে ডারি।
গোয়াল-ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি;
বসল গায়ের মোট্রা মোড়ল গল্প-গানে ম্যতি।
কেতাব পড়ার উঠল তুফান;—চম্পা কালু গাজী,
মামুদ হানিফ সোনাবান ও জয়গুণ বিবি আজি;
সবাই মিলে ফিলছে যেন হাত ধরাধর করি,
কেতাব পড়ার সুরে সুরে চরণ ধরি ধরি।
পড়ে কেতাব গায়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ি,
পড়ে কেতাব গায়ের মোট্রা মাঠ-ফাটা ডাক ছাড়ি।

কৌতুহলী গায়ের লোকে শুনছে পেতে কান,
জুমজুমেরি^২ পানি যেন করছে তারা পান।

১। সপ্ত=সহস্র ২। জুমজুম=জরুরের একটি পবিত্র তুপ।

দেখছে কখন মনের সুখে মামুদ হানিফ যায়,
লাল ঘোড়া তার উড়ছে যেন লাল পাখিটির প্রায়।
কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেমন কলার বাগ,
মেঘের পালে পড়ছে যেন সুন্দর-বুনো বাঘ।
স্বপন দেখে, জয়গুন বিবি পালঙ্কেতে শুয়ে,
মেঘের বরণ চুলগুলি তার পড়ছে এসে ভুঁয়ে;
আকাশেরি চাঁদ সুরুজে মুখ দেবে পায় লাজ,
সেই কনেরে চোখের কাছে দেখছে চাষী আজ।
দেখছে চোখে কারবালাতে ইমাম হোসেন মরে,
রক্ত যাহার জমছে আজো সন্ধ্যা-মেঘের গোরে;
কারখালারি ময়দানে সে ব্যাথার উপাখ্যান;
সারা গায়ের চোখের জলে করিয়া গেল স্নান।

উঠান পরে হলুদ-করে পাড়ার ছেলে মেয়ে
রঙিন বসন উড়ছে তাদের নখর তনু ছেয়ে।
কানা-ঘুমা করত যারা রূপার স্বভাব নিয়ে,
ঘোর কলিকাল দেখে যাদের কানত সদা হিয়ে;
তারাই এখন বিয়ের কাজে ফিরছে সবার আগে,
ভাঙা-গড়ার সকল কাজেই তাদের সমান লাগে।
বউ-খিরা সব রান্না-বাড়ায় ব্যস্ত সকল ক্ষণ;
সারা বাড়ি আনন্দ আজ খুশী সবার মন।
বাহিরে আজ এই যে আমোদ দেখছে জনে জনে;
ইহার চেয়ে দ্বিগুণ আমোদ উঠছে রূপার মনে।
ফুল পাগড়ী মাথায় তাহার 'জোড়া জামা' গায়,
তেল-কুচ-কুচ কাশো রঙে ঝলক দিয়ে যায়।

বউ-খিরা সব ঘরের বেড়ার খানিক করে ফাঁক,
নতুন দুলার' রূপ দেখি আজ চক্রে মারে তাক।

এমন সময় শোর উঠিল—বিয়ের যোগাড় কর,
জলদি করে দুলার মুখে পান শরবত ধর^১।
সাজুর মামা খটকা লাগায়, "বিয়ের কিছু গৌণ,
সাদার পাতা^২ আনেনি তাই বেজার সবার মন।"
রূপার মামা লম্বে দাঁড়ায় দণ্ডে চলে বাড়ি;
সেরেক পাঁচেক সাদার পাতা আনল ভাড়াভাড়ি।
কনের খালু^৩ উঠিয়া বলে "সিদুর হল উনা।"
রূপার খালু আনিয়া দিল যা লাগে তার দুনা।

কনের চাচার মন উঠে না, "খাটো হয়েছে শাড়ী।"
রূপার চাচা দিল তখন 'ইংরেজী বোল ছাড়ি'।
'কিরে বেটা বকিস নাকি?' কনের চাচা ইঁকে,
জালি কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাসে।
"কোথায় গেলি ছদন চাচা, ছমির শেখের নাতি,
দেখিয়ে দেই দুলার চাচার কতই বুকের ছাতি।
বেয়ো বেটা নওশা^৪ নিয়ে, দিব না আজ বিয়া;"
বলতে যেন আগুন ছোট্টে চোখ দুটি তার দিয়া।

১। দুলা=বর।

২। পান শরবত ধর=বিবাহের আগে বরকে পান শরবত খাওয়ান হয়।

৩। সাদার পাতা=ভাতাক পাতা।

৪। খালু= মেশেমশায়। ৫। নওশা=বর।

বরণক্ষের লোকগুলি সব আর যে বরের চাচা,
পালিয়ে যেতে খুঁজছে যেন রশুই ঘরের মাচা।

মোড়ল এসে কনের চাচার অনেক করে বলে,
খামিয়ে তারে বিয়ের কথা পাড়েন কুত্থলে।
কনের চাচা বসল এসে বরের চাচার কাছে,
কে বলে ঝড় এদের মাঝে হয়েছে যে পাছে।
মোল্লা তখন কপমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল ডাকি,
বিয়ে রূপার হয়ে গেল, ক্ষীর-ভোজনী বাকি।
তার মাঝেতে এমন-তেমন হয়নি কিছু গোল,
কেবল একটি বিষয় নিয়ে উঠল হাসির রোল।
এয়োরা সব ক্ষীর ছোঁয়ারে কনের ঠোঁটের কাছে;
সে ক্ষীর আবার ধরল যখন রূপার ঠোঁটের পাছে;
রূপা তখন ফেলল খেয়ে ঠোঁট-ছোঁয়া সেই ক্ষীর,
হাসির তুফান উঠল নেড়ে মেয়ের দপের ভীড়।
ভাবল রূপাই — ওমন ঠোঁটে যে ক্ষীর গেছে ছুঁয়ে,
দোজখ যাবে না খেয়ে তা ফেলবে যে জন জুঁয়ে।

- ১। সাক্ষী উকিল = মুসলমানদের বিবাহের সময় বর-কন্যা একস্থানে থাকে না।
কন্যা-পক্ষের একজন উকিল এবং দুইজন সাক্ষী থাকেন। তাহারা বাড়ির ভিতরে
যাইয়া বিবাহে কন্যার মত আছে কিনা জানিয়া আসেন। উকিল জিজ্ঞাস্য করেন,
সাক্ষীরা তাহা শুনিয়া আসিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় বিবাহ সত্যার সকলকে বলেন।

নয়

মহস্য চেনে গহিন গল্প পঙ্খী চেনে ভাল;
মায় পে জানে বিটার দরদ যার কলিজার শ্যাল।
নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দূধ;
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

— গান্ধীর গান

আষাঢ় মাসে রূপার মায়ে মরল বিকার জুরে,
রূপা সাজু খায়নি খানা সাত আটদিন ধরে।
লালন পালন যে করিত 'ঠোঁটের' আধার দিয়া,
সেই মা আজি মরে রূপার ভাঙল সুখের দিয়া।
ঘামলে পরে যে ডাহারে করত আবেদ পাখা;
সেই স্বাগুড়ী মরে, সাজুর সব হইল ফাঁকা।
সাজু রূপা দুই অনেতে কান্দে গলাগলি;
গাছের পাতা যায় যে ঝরে, ফুলের ভাঙে কলি।
এত দুখের দিনও তাদের আশে হল গত,
আবার তারা সুখেরি ঘর বাঁধল মনের মত।

দশ

বড় ঘর বান্ধাছাও মোনাতাই বড় করছাও আশা

বজলী প্রকাতের কালে পত্নী ছাড়বে বাসা ।

— মুরশীদা গান

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর ।
মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়া বউ গৈহ কাজে,
দুইখান হতে দুটি সুর যেন এ উহারে ডেকে বাজে ।
ঘর চেয়ে থাকে কেন মাঠ পানে, মাঠ কেন ঘর পানে,
দুইখানে রহি দুইজন আজি বৃষ্টিছে ইহার মানে ।

অশ্বিন পেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেড়ের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হলদি-কোটর গান ।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোশন লেগেছে, হেসে কৃষ নাহি পায় ।
আজ্ঞো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
মাঝে মাঠখানি চান্দর বিছায়ে হলুদ বরণ ধানে ।

আজকে রূপার বড় কাজ — কাজ — কোন অবসর নাই,
মাঠে যেই ধান ধরেনাক আজি ঘরে দেবে তারে ঠাই ।
সারা মাঠে ধান, পথে ঘাটে ধান উঠানেতে হুড়াহুড়ি,
সারা গাঁও ভরি চলেছে কে কবি ধানের কাব্য পড়ি ।

আজকে রূপার মনে পড়েনাক শাপলার লতা দিয়ে,
নয়া গৃহিণীর ঝোঁপা বেঁধে দিত চুলগুলি তার নিয়ে ।
সিদুর লইয়া যান হয়নাক বাজে না বাঁশের বাঁশী,
শুধু কাজ—কাজ, কি যাদু-মন্ত্র ধানেরা পড়িছে আসি ।
সারাটি বরষা কে কবি বসিয়া বেঁধেছে ধানের গান,
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী করিয়া সে অবসান ।
আজিকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বৃষ্টি সারা,
ছুটে গৈয়ো পাখি কিঙে বুলবুল তারি গানে হয়ে হারা ।
কৃষাণীর গায়ে গহনা পরায় নতুন ধানের কুটো;
এত কাজ তবু হাসি ধরেনাক, মুখে ফুল ফুটো ফুটো ।
আজকে তাহার পাড়া-বেড়ানর অবসর মোটে নাই,
পার ঝাড়ুগাছি কোথা পড়ে আছে, কেবা খোঁজ রাখে ছাই ।

অর্ধেক রাত উঠানেতে হয় ধানের মলন মলা,
বনের পশুরা মানুষের কাজে মিশায় গলায় গলা ।
দাবায় শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভরি,
ঢেকির পারেতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ি ।
কোন দিন চাষী শুইয়া শুইয়া গাহে বিরহের গান,
কৃষাণের নারী ঘুমাইয়া পড়ে, ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান ।
হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নার জাল পাতি,
টেনে টেনে তারে হয়রান হয়ে ডুবে যায় রাতারাত ।

এমনি করিয়া ধানের কাব্য হইয়া আসিল সারা,
পানের কাব্য আরম্ভ হল সারাটা কৃষাণ পাড়া ।
রাতেরে উহার মানিবে না যেন, নতুন গলার গানে,
বাঁশী বাজাইয়া আজকে রাতের করিবে নতুন মানে ।

আজিকে রূপার কোন কাজ নাই, ঘুম হতে যেন জাগি,
শিয়রে দেখিছে রাজার কুমারী তাহারই ব্যথার ভাগী।
সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি,
ঘুম হতে তারে সবে জাগায়েছে অরুণ-আলোয় সাজি।
নতুন করিয়া আজিকে উহারা চাহিছে এ ওর পানে,
দীর্ঘ কাজের অবসর যেন कहিছে নতুন মানে !
নতুন চাহার নতুন চাহাণী নতুন বেঁধেছে ঘর,
সোহাগে আদরে দুটি প্রাণ যেন করিতেছে নড়বড় !
বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরেছিল, এত দিন পরে আজ,
তেলে জলে আর আদরে তাহার হইল নতুন সাজ।
সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশী,
মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি।

ক্রমে রাত বাড়ে, বউ বসে দূরে, দুটি চোখ ঘুমে ভার,
“পায়ে পড়ি ওগো চলো শূতে যাই, ভাল লাগেনাক আর।”
রূপা ত সে কথা শোনেইনি যেন, বাঁশী বাজে সুরে সুরে,
‘ঘরে দেখে যারে সেই যেন আজি ফেরে ওই দূরে দূরে।’
বউ রাগ করে, “দেখ, বলে রাখি, ভাল হবে নাক পরে,
কালকের মত করি যদি তবে দেখিও মজাটি করে।
ওমনি করিয়া সরাসরাত আজি বাজাইবে যদি বাঁশী,
সিঁদুর আজিকে পরিব না ভালে, কাজল হইবে বাসি।
দেখ, কথা শোন, নইলে এখনি খুলিব কানের দুল,
আজকে ত আমি খোঁপা বাঁধিব না, আলগা রহিবে চুল।”

বৈষ্ণব কীর্তন

বেচারী রূপাই বাঁশী বাজাইতে এমনি অত্যাচার,
কৃষ্ণাণের ছেলে ! অত কিবা বোঝে, তখনই মানিল হার।

কহে জোড় করে, "শোন গো হজুর, অধম বাঁশীর প্রতি,
মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যায় এ যে অতি।
আজকে ও-ভাগে সিঁদুর দিবে না, খুলিবে কানের দুল,
সন্ধ্যা হবে না সিঁদুরে রঙের—ভারে হাসিবে না ফুল !
এত বড় কথা ! আচ্ছা দেখাই, ওরে ও অধম বাঁশী,
এই তরুণীর অধরের গানে তোমার হইবে ফাঁসী।"

হাতে লয়ে বাঁশী বাজাইল রূপা মাঠের চিকন সুরে,
কড়ু দোলাইয়া বউটির ঠোঁটে কড়ু তারে ঘুরে ঘুরে।
বউটি যেন গো হেসে হয়রান, কহে ঠোঁটে ঠোঁট চাপি,
"বাঁশীর দণ্ড হইল, কিন্তু যে বাজাল সেই পাশী?"
পুনঃ জোর করে রূপা কহে, "এই অধমের অপরাধ,
ভয়ানক যদি, দণ্ড তাহার কিছু কম নিতে সাধ।"
রূপার বলার এমনি ভঙ্গী বউ হেসে কুটি কুটি,
কখনও পড়িছে মাটিতে ঢলিয়া, কড়ু গায়ে পড়ে লুটি।
পরে কহে, "দেখো, আরও কাছে এসো, বাঁশীটি লও ত হাতে
এমনি করিয়া দোলাও ত দেখি নোলক দোলার সাথে।"

বাঁশী বাজে আর নোলক যে দোলে, বউ কহে আর বার,
"আচ্ছা আমার বাহুটি নাকিগো সোনালী-লতার হার ?
এই ঘুরালেম, বাজাও ত দেখি এরি মত কোন সুর,"
তেমনি বাহুর পরশের মত বাজে বাঁশী সুমধুর।
দুটি করে রাজা ঠোঁটখানি টেনে কহে বউ, "এরি মত,
তোমার বাঁশীতে সুর যদি থাকে বাজাইলে বেশ হত।"
চলে মেঠো বাঁশী দুটি ঠোঁট ছুঁয়ে কলমী ফুলের বুকে,
ছোট চুমু রাখি চলে যেন বাঁশী, চলে সে যে কোন লোকে।

এমনি করিয়া রাত কেটে যায়; হাসে রবি ধীরে ধীরে,
বেড়ার ফাঁকেতে উঁকি মেরে দেখি দুটি খেলার ছিঁরি।

সেদিন রাতে বাঁশী শূনে শূনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে,
তারি রাজা মুখে বাঁশী-সুরে রূপা বাঁকা-চাঁদ এনে ধরে।
তারপরে, খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম-ফুলেতে রাজা পাও দুটি দেখে আরো রাজা করি,
মৃদু তালে তালে নিঃশ্বাস লয়, শূনে মুখে মুখ বরি।
ভাবে রূপা, ও-যে দেহ ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুষু নিমিষের ভুল।
হায় রূপা, তুই চোখের কাজলে আঁকিলি মোহন ছবি,
এতটুকু ব্যথা না লাগিতে ধেরে ধুরে যাবে তোর সবি !
ওই বাহু আর ওই তনু-লতা ভাসিছে সোঁতের ফুল,
সোঁতে সোঁতে ও যে ভাসিয়া বাইবে ভাঙিয়া রূপার কুল।
বাঁশী লয়ে রূপা বাজাতে বসিল বড় ব্যথা তার মনে,
উদাসীয়া সুর মাথা কুটে মরে তাহার ব্যথার সনে।

ধারায় ধারায় জল ছুটে যায় রূপার দুচোখ বেয়ে,
বউটি তখন জাগিয়া উঠিল তাহার পরশ পেয়ে।
"ওমা ওঁকি ? তুমি এখনো শোওনি ! খোলা কেন মোর চুল ?
ওঁকি ! দুই পায়ে কে দেছে ঘষিয়া রঙিন কুসুম ফুল ?
ওঁকি ! ওঁকি !! তুমি কান্দছিলে বুঝি ! কেন কান্দছিলে বল ?"
বলিতে বলিতে বউটির চোখ জলে করে ছল ছল।
বাহুখানা তার কাঁধ পরে রাখি রূপা কয় মৃদু সুরে,
"শোন শোন সুই, কে যেন তোমায় নিয়ে যেতে চায় দূরে !

“সে দূর কোথায়?” “অনেক—অনেক—দেশ যেতে হয় ছেড়ে,
সেখা কেউ নাই শুধু তুমি আর সেই সে অচেনা ফেরে।
তুমি ঘুমাইলে সে এসে আমায় কয়ে যায় কানে কানে,
যাই—যাই—ওরে নিয়ে যাই আমি আমার দেশের পানে।
বল, তুমি সেখা কখন যাবে না, সত্য করিয়া বল!”
“নয়! নয়! নয়!” বউ কহে তার চোখ দুটি ছিলছিল।

রূপা কয় “শোন সোনার বরগি, আমার এ কুঁড়ে ঘর,
তোমার রূপের উপহাস শুধু করে সারাদিন ভর।
তুমি ফুল! তব ফুলের গায়েতে বহে বিহানের বায়,
আমি কাঁদি সই রোদ উঠিলে যে ফুরাবে রঙের আয়।
আহা আহা সখি, তুমি যাহা কর, মোর মনে লয় তাই,
তোমার ফুলের পরাণে কেবল দিয়ে যায় বেদনাই।”
এমন সময় বাহির হইতে বহির মামুর ডাকে,
ধড়মড় করি উঠিয়া রূপাই চাহিল বেড়ার ফাঁকে।

এগারো

সাজে সাজে বলিয়ারে শহরে শৈল সাড়া,
সাত হাজার বাজে ঢোল চৌদ্দ হাজার কাড়া।
প্রথমে সাজিল মর্দ অগ্নিদি ডগরী,
পাঁচ কাঠা জুই জুইড়া বসে মর্দ এয়াসা ভারি।
তারপরে, সাজিল মর্দ তুতুক আমানি,
সমুদুরে নামলে তার হৈত অঁটুপানি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে লোহাজুড়ী
আছড়াইয়া মারত সে হাতীর শৃঁড় ধরি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে আইন্দ্যা ছাইন্দ্যা,
বাইশ মণ তামাক নেয় তার লেটের মধ্যে বাইন্দ্যা।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে মদন ঢুলি,
বাইশ মণ পিতল তার ঢোলের চারটা খুলী।
আতালী পাতালী সাজে গগনেরী ঠাটা,
মেঘনাল সাজিয়া আইল তাম তুতুকের বেটা।
তুগুলি মৃগুলি সাজে তারা দুই ভাই,
ঐরাবতে সাইজা আইল আজদাহা সেপাই।
বন্ধুকি বন্ধুকি চলে কামানে কামান,
ময়ূর-ময়ূরী চলে ধরিয়া পয়গাম।

— মহরমের জারী

“ও রূপা তুই করিস কিরে? এখনো তুই রইলি শূয়ে?
বন-গোয়রা ধান কেটে নেয় গাজনা-চরের খায়ার জুয়ে।”
“কি বলিলা বহির মামু?” উঠল রূপাই হাঁক ছাড়িয়া,
আগুনভরা দুচোখ হতে গোলা-বারুদ যায় উড়িয়া;

পাটার মত বুকখানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে,
বুকের হাড়ে লাগল বাড়ি, আগুন বুঝি জ্বলবে তাতে !
লক্ষে রূপা আনলো পেড়ে চাং হতে তার সড়কি খানা,
ঢাল খুলায়ে মাজার সাথে খালে খালে মারল হানা ।
কোথায় রল রহম চাচা, কলম শেখ আর ছমির মিঞা,
সাইদ পাড়ার খাঁরা কোথায় ? কাজীর পোরে^১ আন ডাকিয়া ?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় থাকতে মোরা গফর-গায়ে,
এই কথা আজ শোনার আগে যিনি ক্যান পোরের ছায়ে ?
‘আলী — আলী’ হাঁকল রূপাই, হুঙ্কারে তার গগন ফাটে,
হুঙ্কারে তার গর্জে বহির আগুন যেন ধরল কাঠে !
ঘুম হতে সব গায়ের লোকে শুনল যেন রূপার বাড়ি;
আকাশ হতে ভাঙছে ঠাটা^২, মেঘে মেঘে লাগছে বাড়ি ।
ডাক শুনে তার আসল ছুটে রহম চাচা, ছমির মিঞা,
আসল হেঁকে কাজেম খুনী নখে নখে আঁচড় দিয়া ।
আসল হেঁকে গায়ের মোড়ল মালকোছাতে কাপড় পরি,
এক নিমিষে গায়ের লোকে রূপার বাড়ি ফেলল ভরি ।
লক্ষে দাঁড়ায় ছমির লেঠেল, মমিনপুরের চর দখলে,
এক লাঠিতে একশ লোকের মাথা যে জন আসল দলে ।
দাঁড়ায় গায়ের ছমির বুড়ো, বয়স তাহার যদিও আশী,
গায়ে তাহার আজও আছে একশ লড়ার দাগের রাশি ।

১। পো=ছেলে ।

২। আলী=হজরত আলী; হজরত মুহাম্মদের (সঃ) জামাতা । তিনি মহাবীর ছিলেন ।

এদেশে মারামারির সময় সকলে মিলিয়া “আলী আলী” শব্দ করে । কারও কারও মতে
“আলী” অথবা “আল্লা” শব্দের অপভ্রংশ ।

৩। ঠাটা=অশনি ।

গর্জি উঠে গদাই ভুঁঞা, মোহন ভুঁঞার ভাজন^১ বেটা,
যার লাঠিতে মামুদপুরের মীল কুঠিতে লাগল নেটা ।
সব গাঁৱ লোক এক হল আজ রূপার ছোট উঠান পরে,
নাগ-নাগিনী আসল যেন সাপ খেলানো বাঁশীর স্বরে ।

রূপা তখন বেড়িয়ে তাদের বলল, “শোন ভাই সকলে,
গাজনা চরের ধানের জমি আর আমাদের নাই দখলে ।”
বহির মামু বলছে বরর—মোল্লারা সব কালকে নাকি;
আধেক জমির ধান কেটেছে, আধেক আজও রইছে বাকি ।
“মোদের খেতে ধান কেটেছে, কালকে যারা কাঁচির^২ বোঁচায়;
আজকে তাদের নাকের ডগা বাঁধতে হবে লাঠির আগায় ।”
ধামল রূপাই—ঠাটা যেমন মেঘের বুকে বাণ হানিয়া,
নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন জুবড়ী বাঁশীর সুর হাঁকিয়া ।
গর্জে উঠে গায়ের পোকে, লাটিম হেন ঘোড়ার লাঠি,
রোহিত মাহের মতন চলে, লাকিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি ।

রূপাই তাদের বেড়িয়ে বলে, “থাল বাজারে থাল বাজারে,
থাল বাজারে সড়কি ঘুরা হান্দের লাঠি এক হাজারে ।
হান্দের লাঠি — হান্দের কুঠার, গাহের ছ্যান^৩ আর রাম-দা-ঘুরা,
হাতের মাথায় যা পাস যেথায় তাই লয়ে আজ আয়রে তোরা ।”
“আলী ! আলী ! আলী !! আলী !!!” রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি,
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে কাঁপছে আকাশ কাঁপছে মাটি ।
তারি সুরে সব লেঠেলে লাঠির পরে হানল লাঠি,
“আলী-আলী” শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি ।

১। ভাজন=ওরসজাত ।

২। কাঁচির=কাস্তুর ।

৩। গাহের ছ্যান=শেজুর গাহের ডগা কাটবার অস্ত্র ।

আগে আগে ছুটল রূপা — বৌ বৌ বৌ সড়কি ঘোরে,
কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথায় চুল যে ওড়ে
চলল পাছে হাজার লেঠেল “আলী-আলী” শব্দ করি,
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধুলো আকাশ বুঝি ফেলবে ভরি !
চলল তারা মাঠ পেরিয়ে চলল তারা বিল ডিঙিয়ে
কখন ছুটে কখন হেঁটে বৃকে বৃকে তাল ঠুকিয়ে ।
চলল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাট মেঘের দল ছুটে বায়,
বাও কুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে ধূলি পথ ভরি হয় !

দুপুর বেলা এল রূপাই গাভনা চরের মাঠের পরে,
সঙ্গে এল হাজার লেঠেল সড়কি লাঠি হস্তে ধরে ।
দশে রূপা শূন্যে উঠি পড়ল কুঁদে মাটির পরে,
ধাক্কল খানিক মাঠের মাটি দস্ত দিয়ে কামড়ে ধরে ।
মাটির সাথে মুখ লাগায়ে, মাটির সাথে বুক লাগায়ে,
“আলী ! আলী !!” শব্দ করি মাটি বুঝি দ্যায় ফটায়ে ।
হাজার লেঠেল ছুড়ায় কয় “আলী আলী হজরত আলী,”
সুর শূন্যে তার বন-গোয়াদের কর্ণে বুঝি লাগল তালি ।
তারাও সবে আসল জুটে দলে দলে ভীম পালোয়ান,
“আলী আলী” শব্দে যেন পড়ল ভেঙে সকল গাঁথান ।
সামনে চেয়ে দেখল রূপা সারি বেঁধে সব আসছে তারা,
ওপার মাঠের কোল ঘেঁষে কে বাকী ভীরে দিগ্ধে নাড়া ।
রূপার দলে এগোয় যখন, তারা তখন পিছিয়ে চলে,
তারা আবার এগিয়ে এলে এরাও হটে নানান কলে ।

এমনি করে সাত আটবারে এগোন পিছন হল যখন,
রূপা বলে, “এমন করে ‘কাইজা’ করা হয় না কখন ।”

তাল ঠুকিয়া ছুটল রূপাই, ছুটল পাছে হাজার লাঠি,
 “আলী-আলী — হজরত আলী” কণ্ঠ তাদের যায় যে ফাটি।
 তাল ঠুকিয়া পড়ল তারা বন-গেয়োদের দলের মাঝে,
 লাঠির আগায় লাগল লাঠি, লাঠির আগায় মড়কি বাজে।
 ‘মার মার মার’ হাঁকল রূপা, — ‘মার মার মার’ ঘুরায় লাঠি,
 ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।
 আজ যেন সে মৃত্যু-জনম ইহার অনেক উপরে উঠে,
 জীবনের এক সত্য মহান লাঠির আগায় নিচ্ছে লুটে !
 মরণ যেন মুখোমুখি নাচছে তাহার নাচার তালে,
 মহাকালের বাজছে বিষণ্ণ আজকে ধরার প্রলয় কালে।
 নাচে রূপা — নাচে রূপা — লোহুর গাঙে সিনান করি,
 মরণের সে ফেলছে ছুঁড়ে রক্তমাখা হস্তে ধরি।
 নাচে রূপা — নাচে রূপা — মুখে তাহার অট্টহাসি,
 বকে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।
 — হাড়ে হাড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন
 কি যেন সে দেখেছে আজ, রুধুতে নারে তারি মাতন।
 বন-গেয়োরা পালিয়ে গেল, রূপার লোকও ফিরল বহু,
 রূপা তবু নাচছে, গায়ে তাজা-বুনের হাসছে লোহ।

বার

রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে।
 বেলা গেল সন্ধ্যা হইল — ও হৈলরে ! গৃহে জ্বালাও বাতি,
 না জানি অবলার বন্ধু আসবেন কত রাত্তিরে।

রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।

রাইত না এক পরের হৈল, ও হৈলরে ! তারায় জ্বলে বাতি;
 রাশিয়া বাড়িয়া অনু জাগুব কত রাত্তিরে ;

রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।

রাইত না দুই পরের হৈল ও হৈল রে, ডালে ডাকে শূয়া,
 অকল বিছায়া নারী কাটে চেকন গুয়ারে।

রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।

রাইত না পরভাত হৈল — ও হৈলরে, কোকিল করে কুয়া,
 খুলিলে দাও মন্দিরার কেওয়াড় লাগুক শীতল হাওয়ায়ে।

রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।

— রাখালী গান

রূপাই গিয়াছে ‘কাইজা’ করিতে সেই ত সকাল বেলা,
 বউ সারাদিন পথ পানে চেয়ে, দেখেছে লোকের মেলা।
 কত লোক আসে কত লোক যায়, সে কেন আসে না আজ,
 তবে কি তাহার নসিব মন্দ, মাথায় ভাঙিবে বাজ।
 বালাই, বালাই, ওই যে ওখানে কালো গাঁর পথ দিয়া,
 আসিছে লোকটি, ওই কি রূপাই ? নেচে ওঠে তার হিয়া।
 এলে পরে তারে খুব বকে দিবে, মাথায় ছোঁয়ায়ে হাত,
 কিরা করাইবে লড়ায়ের নামে হবে না সে আর মাত।

আঁচলে চোখে বারবার মাজে, না রে সে ত ও নয়,
আজকে তাহার কপালে কি আছে, কে তাহা ভাঙিয়া কয়।
লোহর সাগরে সাঁতার কাটিয়া দিবস শেষের বেলা,
রাত্র-রাণীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।
পথে যে আঁধার পড়িল সাজুর মনে তার শতগুণ,
রাত এসে তার ব্যথার ঘায়েতে ছিটাইল যেন নুন।

ঘরের মেঝেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্সী-কাঁথা,
সেলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা।
পাতায় পাতায়, বস্ বস্ বস্ শূনে কান ঝাড়া করে,
যারে চায় সে ত আসেনাক শূধু ডুল করে করে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে, ভাল লাগেনাক তার;
আলো হাতে লয়ে দূর পানে চায়, বার বার খুলে ঘার।
কেন আসে নারে। সাজুর যদি গো পাখা দিত আজ বিধি,
উড়িয়া যাইয়া দেখিয়া আসিত তাহার সোনার নিধি।
নক্সী-কাঁথায় আঁকিল যে সাজু অনেক নক্সী-ফুল,
প্রথমে যেদিন রূপারে সে দেখে, সে খুশীর সমতুল।
আঁকিল তাদের বিয়ের বাসর, আঁকিল রূপার বাড়ি,
এমন সময় বাহিরে কে দেখে আসিতেছে ডাড়াডাড়া।

দুয়ার খুলিয়া দেখিল সে চেয়ে — রূপাই আসিছে বটে,
“এতক্ষণে এলে? ভেবে ভেবে যোগো প্রাণ নাই মোর ঘটে।
আর যাইও না কাইজা করিতে, তুমি যাহাদের যারো,
তাদের ঘরে ত আছে কাঁচা বউ, ছেলেমেয়ে আছে কারো।”
রূপাই কহিল কাঁদিয়া, “বউগো ফুরায়েছে মোর সব,

রাতে ঘুম যেতে শুনবে না আর রূপার বাঁশীর রব।
লড়ায়ে আজিকে কত মাথা আমি ভাঙিয়াছি দুই হাতে,
আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙেছে তাতে।
লোহ লয়ে আজ সিনান করেছি, রক্তে ভেসেছে নদী,
বুকের মালা যে ভেসে যাবে তাতে আগে জানিতাম যদি।
আঁচলের সোনা বসে যাবে পথে আগে যদি জানিতাম,
হায় হায় সখি, নারিনু বলিতে কি যে তবে করিতাম।”

বউ কেঁদে কয়, “কি হয়েছে বল, লাগিয়াছে বুঝি কোথা,
দেখি। দেখি। দেখি। কোথায় আঘাত, খুব বুঝি তার ব্যথা।”
“লাগিয়াছে বউ, খুব লাগিয়াছে, নহে নহে মোর গায়,
তোমার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়েছে, কাঁকন ভেঙেছে হায়।
তোমার পায়ের ভাঙিয়াছে খাড়ু, ছিঁড়েছে গলার হার,
তোমার আমার এই শেষ দেখা, বাঁশী বাজিবে না আর।
আজ ‘কাইজার’ অপর পক্ষে খুন হইয়াছে বহ।
এই দেখ মোর কাপড়ে এখনো লাগিয়া রয়েছে লোহ।
ধানার পুলিশ আসিছে ইঁকিয়া পিছে পিছে মোর ছুটি,
বোঁজ পেলো পরে এখনি আমায় ধরে নিয়ে ধাবে টুটি।
সাধীরা সকলে যে যাহার মত পানিয়েছে কথা-তথ্য,
আমি আসিলাম তোমার সঙ্গে সেরে নিতে সব কথা।
আমার জন্য ভাবিনাক আমি, কঠিন ঝড়িয়া-বায়,
যে গাছ পড়িল, তাহার লতার কি হইবে আজি হায়।
হায় বনফুল, যেই ডালে তুই দিরেছিলি পাতি বুক,
সে ডালের সাথে ভাঙিয়া পড়িল তোর সে সকল সুখ।
ঘরে যদি মোর মা থাকিত আজ তোমারে সঙ্গে করি,
বিন্দি রাত কাঁদিয়া কাটাত মোর কথা স্মরি স্মরি।

ডাই থাকিলেও ডাই-এর বউরে রাখিত যতন করি,
তোমার ব্যথার আক্ষেপটা তার আপনার বুকে ভরি।
আমি যে যাইব অভিনাক, সাথে যাইবে কপাল-লেখা,
এ যে বড় ব্যথা। তোমারো কপালে একে গেনু তারি রেখা।”
সাজু কেঁদে কয়, “সোনার পতিরে তুমি যে যাইবে ছাড়ি,
হয়ত তাহাতে মোর বুকখানা যাইতে চাহিবে ফাড়ি।
সে দুখেরে আমি ঢাকিয়া রাখিব বুকের আঁচল দিয়া,
এ পোড়া রূপেরে কি দিয়ে ঢাকিব—ভেবে মরে মোর হিয়া।
তুমি চলে গেলে পাড়ার সোকে যে চাহিবে ইহার পানে,
তোমার গলার মালাখানি আমি লুকাইব কোন্ খানে।”

রূপা কয়, “সখি দীন দুখীর যারে ছাড়া কেহ নাই,
সেই আল্লার হাতে আজি আমি তোমারে সঁপিয়া যাই।
মাকড়ের আঁশে দস্তী যে বাঁধে, পাথর ভাসায় জলে,
তোমারে আজিকে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণ তলে।”

এমন সময়ে ঘরের খোপেতে মোরগ উঠিল ডাকি,
রূপা কয়, “সখি। যাই — যাই আমি — রাত বুঝি নাই বাকি।”
পায়ে পায়ে পায়ে কতদূর যায়; সাজু কয়, “ওগো শোন,
আর কিম্বা নাই মোর কাছে তব বলিবার কথা কোন ?
দীঘল রজনী — দীঘল বরষ — দীঘল ব্যথার ভার,
আজ শেষ দিনে আর কোন কথা নাই তব বলিবার ?”
রূপা কহিলে কয়, “না কাঁদিয়া সখি, পারিলামনাক আর,
ক্ষমা কর মোর চোখের জলের নিশাল^১ দেয়ার ধার।”

১। নিশাল=অবিরাম।

“এই শেষ কথা।” সাজু কহে কেঁদে, “বলিবে না আর কিছু?”
 খানিক চলিয়া খামিল রূপাই, কহিল চাহিয়া পিতৃ,
 “মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
 দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কালনের রাগে।
 সিন্দুরখানি পরিও ললাটে—মোরে যদি পড়ে মনে,
 রাজ্য শাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশী-কোণে।
 মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যতনে বাঁধিও চুল,
 আলসে হেলিয়া খোঁপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল।
 যদি একা রাতে ঘুম নাহি আসে — না শুনি আমার বাঁশী,
 বাহুখানি তুমি এলাইও সখি মুখে মেখে রাজ্য হাসি।
 চেয়ো মাঠ পানে — গলায় গলায় দুলিবে নতুন ধান;
 কান পেতে খেকো, যদি শোন কভু সেখায় আমার গান।
 আর যদি সখি, মোরে ভালবাস মোর তরে লাগে মায়া,
 মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া।”

ঘরের খোপেতে মোরগ ডাকিল, কোকিল ডাকিল ডালে,
 দিনের তরঙ্গী পূর্ব সাগরে দুলে উঠে রাঙা পালে।
 রূপা কহে, “তবে যাই যাই সখি, যেটুকু আঁধার বাকি,
 তারি মাঝে আমি গহন বনেতে নিজেই ফেলিব চাকি।”
 পায়ে পায়ে পায় কতদূর যায়, তবু ফিরে ফিরে চায়;
 সাজুর ঘরেতে দীপ নিবু নিবু ভোরের উতলা বায়।

তেরো

বিন্যাসেতে রইল মোর বন্ধুরে।
 বিধি যদি দিত পাখা,
 উইড়া ছাড়া মিডাম দেখা;
 আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশেরে।
 আমরা ত অবলা নারী,
 তরুতলে বাসা বাকিরে;
 আমার বদন চুরায় পড়ে ঘামবে।
 বন্ধুর বাড়ী গমার পাব
 গেলে না আসিবা আর;
 আমার না-জান বন্ধু, না জানে সোতাররে।
 বন্ধু যদি আমার হও
 উইড়া আইসা দেখা দাও
 তুমি দাও দেখা জুড়াক পরাণেরে।
 — রাখালী গান

একটি বছর হইয়াছে সেই রূপাই গিয়াছে চলি,
 দিনে দিনে দিন নব আশা লয়ে সাজুরে গিয়াছে চলি।
 কইকায় যারা গিয়াছিল গাঁও, তারা কিরিয়াছে বাড়ি,
 শহরের জল, মামলা হইতে সবারে দিয়াছে ছাড়ি।
 স্বামীর বাড়িতে একা মেয়ে সাজু কি করে থাকিতে পারে,
 তাহার মায়ের নিকটে সকলে আনিয়া রাখিল তারে।
 একটি বছর কেটেছে সাজুর একটি যুগের মত,
 প্রতিদিন আসি, বুকেখানি তার করিয়াছে শুধু ক্ষত।
 ও-পায়ে রূপার ভাঙা ঘরখানি মেঘ ও বাতাসে হায়,

খুঁটি ভেঙে আজ হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে পথের পাশ।
 প্রতি পলে পলে খসিয়া পড়িছে তাহার চালের ছানি,
 তারও চেয়ে আজি জীর্ণ শীর্ণ সাজুর হৃদয়খানি।
 দুখের রজনী যদিও বা কাটে—আসে যে দুখের দিন,
 রাত দিন দুটি ভাই বোন যেন দুখেরই বাজায় বীণ।
 কৃষাণীর মেয়ে, এতটুকু বুক, এতটুকু তার প্রাণ,
 কি করিয়া সহে দুনিয়া জুড়িয়া অসহ দুখের দান !
 কেন বিধি তারে এত দুখ দিল, কেন, কেন, হায় কেন,
 মনের-মতন কাদায় তাহারে 'পথের কাঙালী' হেন ?

সোঁতের শেহলা ভাসে সোঁতে সোঁতে, সোঁতে সোঁতে ভাসে পানা,
 দুখের সাগরে ভাসিছে তেমনি সাজুর হৃদয়খানা।
 কোন্ জালুয়ার' মাছ সে খেয়েছে নাহি দিয়ে তার কড়ি,
 তারি অভিশাপ ফিরিছে কি তার সকল পরাণ স্তরি !
 কাহার গাছের জালি কুমড়া সে ছিড়েছিল নিজ হাতে,
 তাহারই ছোঁয়া কি লাগিয়াছে আজ তার জীবনের পাতে !
 তোর দেশে বৃষ্টি দয়া মায়া নাই, হা-রে নিদাক্ষণ বিধি
 কোন্ প্রাণে তুই কেড়ে নিয়ে গেলি তার আঁচলের নিধি।
 নয়ন হইতে উড়ে গেছে হায় তার নয়নের তোতা,
 যে ব্যথারে সাজু বহিতে পারে না, আজ তা রাখিবে কোথা ?

১। জালুয়া=কোঁপে।

এমনি করিয়া কাদিয়া সাজুর সারাটি দিবস কাটে,
 আনমনে কভু একা চেয়ে রয় দীঘল গাঁয়ের বাটে।
 কাদিয়া কাদিয়া সকাল যে কাটে—দুপুর কাটিয়া যায়,
 সন্ধ্যার কোলে দীপ নিবু-নিবু সোনালী মেঘের নায়।
 তবু ত আসে না। বুকখানি সাজু নখে নখে আজ ধরে,
 পারে যদি তবে ছিড়িয়া ফেলায় সন্ধ্যার কাল গোরে।

মেয়ের এমন দশা দেখে যার সুখ নাই কোন মনে,
 রূপারে তোমরা দেখেছো কি কেউ, শূধায় সে জনে জনে।
 গাঁয়ের সবাই অন্ধ হয়েছে, এত লোক হাটে যায়,
 কোন দিন কিগো রূপাই তাদের চক্ষে পড়েনি হায় !
 খুব ভাল করে খোঁজে যেন তারে, বুড়ী ভাবে মনে মনে,
 রূপাই কোথাও পালাইয়া আছে হয়ত হাটের কোণে।
 ভাদ্র মাসেতে পাটের বেপারে কেউ কেউ যায় গাঁয়,
 নানা দেশে তারা নাও বেয়ে যায় পদ্মানদীর পার।
 জনে জনে বুড়ী বলে দেয়, “দেখ, যখন যেখানে যাও,
 রূপার তোমরা ভালাস লইও, খোদার কছম খাও।”
 বর্ষার শেষে আনন্দে তারা ফিরে আসে নায়ে নায়ে,
 বুড়ী ডেকে কয়, “রূপারে তোমরা দেখ নাই কোন গাঁয়ে।”
 বুড়ীর কথার উত্তর দিতে তারা নাহি পায় ভাষা,
 কি করিয়া কহে, আর আসিবে না যে পাখি ছেড়েছে বাসা।

চৈত্র মাসেতে পশ্চিম হতে জন খাটিকার তরে,
 মাখাল মাথায় বিদেশী চাষীরা সারা গোও ফেলে ভরে।
 সাজুর মায়ে যে ডাকিয়া তাদের বসায় বাড়ির কাছে,
 তামাক খাইতে হঁকো এনে দ্যায়, জিজ্ঞাসা করে পাছে:

“তোমরা কি কেউ রূপাই বলিয়া দেখেছ কোথাও করে,
নিটল তাহার গঠন গঠন, কথা কয় ভায়ে ভায়ে।”
এমনি করিয়া বলে বুড়ী কথা, তাহারা চাহিয়া রয়, —
রূপারে যে তারা দেখে নাই কোথা, কেমন করিয়া কয়!
যে গাছ ভেঙেছে ঝড়িয়া বাতাসে কেমন করিয়া হয়,
তারি ভালগুলো ভেঙে যাবে তারা কঠোর কুঠার-ঘায় ?

কেউ কেউ বলে, “তাহারি মতন দেখেছি নু একজনে,
আমাদের সেই ছোট গাঁর পথে চলে যেতে আনমনে।”
“আচ্ছা, তাহারে শুধাও নি কেহ, কখন আসিবে বাড়ী,
পরদেশে সে যে কোন প্রাণে রয় আমার সাজুরে ছাড়ি ?”
গাঙে-পড়া-লোক যেমন করিয়া তৃণটি আঁকড়ি ধরে,
তেমনি করিয়া চেয়ে রয় বুড়ী তাদের মুখের পরে।
মিথ্যা করেই তারা বলে, “সে যে আসিবে ভাদ্র মাসে,
খবর দিয়েছে, বুড়ী যেন আর কাঁদে না তাহার আশে!”
এত যে বেদনা তবু তারি মাঝে একটু আশার কথা,
মুহূর্ত্তে যেন মুছাইয়া দেয় কত বরষের ব্যথা।
মেয়েরে ডাকিয়া বার বার কহে “ভাবিস না মাগো আর,
বিশেষী চাষীরা কয়ে গেল মোরে — খবর পেয়েছে তার।”
মেয়ে শুধু দুটি ভাষা-ভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে;
কত ব্যথা তার কমিল ইহাতে সেই তাহা আজ জানে।
গণিতে গণিতে শ্রাবণ কাটিল, আসিল ভাদ্র মাস,
বিরহী নারীর নয়নের জলে ভিজিল বুকের বাস।

আজকে আসিবে কালকে আসিবে, হায় নিদারুণ আশা,
ভোরের পাখির মতন শুধুই ভোরে ছেড়ে যায় বাসা।
আজকে কতনা কথা লয়ে যেন বাজিছে বুকের বীণে,
সেই যে প্রথম দেখিল রূপারে বদনা-বিয়ের দিনে।
তারপর, সেই হাট ফেরা পথে তারে দেখিবার তরে,
ছল করে সাজু দাঁড়িয়ে থাকিত গায়ের পথের পরে।
নানা ছুতো ধরি কত উপহার তারে সে যে দিত আনি,
সেই সব কথা আজ তার মনে করিতেছে কানাকানি।
সারা নদী ভরি জাল ফেলে গেলে যেমনি করিয়া টানে,
কখন উঠায়, কখন নামায়, যত দয় তার প্রাণে;
তেমনি সে তার অতীতেরে আজি জ্বালে জড়াইয়া টানে,
যদি কোন কথা আজিকার দিনে কয়ে যায় নব-মানে।

আর যেন তার কোন কাজ নাই, অতীত আঁধার গাঙে,
ডুবাক্রম মত ডুবিয়া ডুবিয়া মানিক মুকুতা মাঙে।
এতটুকু মান, এতটুকু ব্রহ্ম এতটুকু হাসি খেলা,
তারি সাথে সাজু ভাসাইতে চায় কত না সুখের ভেলা।
হায় অভাগিনী ! সে ত নাহি জানে আগে যারা ছিল ফুল,
তারাই আজিকে ভুজঙ্গ হয়ে দহিছে প্রাণের মূল।
যে বাঁশী শুনিয়া ঘুমাইত সাজু, আজি তার কথা শ্রি,
দহন নাগের গলা জড়াইয়া একা জাগে বিভাবরী।

মনে পড়ে আজ সেই শেষ দিনে রূপার বিদায় বাণী —
“মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পরিও সিঁদুরখানি।”
আরও মনে পড়ে, “দীন দুঃখীর যে ছাড়া ভরসা নাই,
সেই আশ্রয় চরণে আজিকে তোমারে সঁপিয়া যাই !”

হায় হায় পতি, তুমি ত জান না কি নিষ্ঠুর তার মন;
সাজুর বেদনা সকলেই শোনে, 'শোনে না সে একজন।
গাছের পাতারা ঝরে পড়ে পথে, পশুপাখি কাঁদে বনে,
পাড়া প্রতিবেশী নিতি নিতি এসে কেঁদে যায় তারি সনে।
হায়রে বধির, তোমার কানে আজ যায় না সাজুর কথা;
কোথা গেলে সাজু জুড়াইবে এই এক বুক-ভরা ব্যথা।
হায় হায় পতি, তুমি ত ছাড়িয়া রয়েছ দূরের দেশে,
আমার জীবন কি করে কাটিবে কয়ে যাও কাছে এসে।
দেখে যাও তুমি দেখে যাও পতি তোমার লাউ-এর লতা,
পাতাগুলি তার উনিয়া পড়েছে লয়ে কি দারুণ ব্যথা।
হালের খেতেতে মন টিকিত না আধা কাজে কেলে বাকি,
আমারে দেখিতে বাড়ি যে আসিতে করি কতরূপ ফাঁকি।
সেই মোরে ছেড়ে কি করে কাটাও দীর্ঘ বরষা মাস,
বলিতে বলিতে ব্যথার দহনে থেমে আসে যেন শ্বাস।

নক্ষত্রী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তাব জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।
এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন,
কৃষাণীর ঘরে আদরিণী মেয়ে সারা গায়ে সুখ-চিন।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে, সিলাই করেছে সে যে;
গুনগুন করে গান কভু রাঙা চোটেতে উঠেছে বেজে।

সেই কাঁথা আজো মেলিয়াছে সাজু যদিও সেদিন নাই,
সোনার স্বপন আজিকে তাহার পুড়িয়া হয়েছে ছাই।

বুঝ ধরে ধরে অঁকিল যে সাজু রূপার বিদায় ছবি,
 খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, অঁকিল সে তার সবি।
 অঁকিল কাঁথায় — আলু থালু বেশে চাহিয়া কৃষ্ণা নারী,
 দেখিছে — তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মত ছাড়ি।
 অঁকিতে অঁকিতে চোখে জল আসে, চাহনি যে যায় ধুয়ে,
 বুকে কর হানি, কাঁথার উপরে পড়িল যে সাজু শূয়ে।
 এমনি করিয়া বহুদিন যায়, মানুষে যত না সহে,
 তার চেয়ে সাজু অসহ্য ব্যথা আপনার বুকে বহে।
 তারপর শেষে এমনি হইল, বেননার ঘায়ে ঘায়ে,
 এমন সোনার তনুখানি তার ভাঙিল ঝড়িয়া-বায়ে।
 কি যেন দারুণ রোগেতে খরিল, উঠিতে পারে না আর;
 শিয়রে ষসিয়া দুঃখিনী জননী মুছিল নয়ন-ধার।
 হায় অভাগীর একটি মানিক! খোদা, তুমি ফিরে চাও,
 এরে যদি নিবে তার আগে তুমি মায়েরে লইয়া যাও!
 ফিরে চাও তুমি আল্লা রসুল! রহমান তব নাম,
 দুনিয়ায় আর কহিবে না কেহ তারে যদি হও কাম!

মেয়ে কয়, “মাগো! তোমার বেদনা জানি আমি সব জানি
 তার চেয়ে যেগো অসহ্য ব্যথা ভাঙে মোর বুকেখানি!
 সোনা মা আমার! চক্ষু মুছিয়া কখা শোন, বাও মাথা,
 ঘরের মেঝে মেনে ধর দেখি আমার নক্সী-কাঁথা!
 একটু আমারে ধর দেখি মাগো, সূঁচ সুতা দাও হাতে,
 শেষ ছবিখানা ঐকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তাতে।”
 পাণ্ডুর হাতে সূঁচ লয়ে সাজু অঁকে খুব ধীরে ধীরে,
 অঁকিয়া অঁকিয়া অঁখি জল মুছে দেখে কত ফিরে ফিরে।

কাঁথার উপরে অঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি,
 তারি কাছে এক গৈয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি;
 রাত আন্ধার, কবরের পাশে বসি বিরহীর বেশে,
 অঝোরে বাজায় বাঁশের বাঁশীটি, বুক যায় জলে ভেসে।

মনের মতন অঁকি এই ছবি দেখে বারবার করি,
 দুটি পোড়া চোখ বারবার শূণ্য অশ্রুতে উঠে ভরি।
 দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া কহিল মায়েরে ডাকি,
 “সোনা মা আমার! সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি;
 এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে,
 ভোরের শিশির কাদিয়া কাদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে!
 সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
 জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
 হয়তো আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে,
 হয়ত তাহারে কাদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
 এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
 তার অঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী-কাঁথার পরে।
 মোর যত ব্যথা, মোর মত কাদা এরি বুকে লিখে যাই,
 আমি গেলে মোর কবরের গায় এরে মেলে দিও তাই!
 মোর ব্যথা সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল করে,
 জনমের মত সব কাদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে।”
 বলিতে বলিতে আর যে পারে না, জড়াইয়া আসে কথা,
 অচেতন হয়ে পড়িল যে সাজু লয়ে কি দারুণ ব্যথা!

কানের কাছেতে মুখ নিয়ে যাতা ডাক ছাড়ি কোঁদে কয়,
“সাজু সাজু ! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে নয় ?”
“আপ্লা রসুল ! আপ্লা রসুল !” বুড়ী বলে হাত তুলে,
“দীন দুঃখীর শেষ কান্না এ আজিকে যেয়ো না ভুলে!”
দুই হাতে বুড়ী জড়াইতে যায় আঁধার রাতের কানি,
উতলা বাতাস ধীরে বয়ে যায়, সব খালি । সব খালি !!
“সোনার সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কি করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে ।”

দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে,
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতল হাওয়ার দাপে ।

চৌদ্দ

উইড়া খায়রে হংস পঙ্খি পইড়া রমারে ছায়া,
দেশের মানুষ দেশে যাইব — কে করিবে মায়্যা।

— মূর্শিদা গান

আজ্ঞো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
নীরবে বসিয়া কোন কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।
মধ্যে অধই শুন্যে মাঠখানি ফটিলে ফটিলে ফাটি,
ফাটনের রোদে শুধাইছে যেন কি বাথারে মুক মাটি !
নিষ্ঠুর চাষীরা বুক হতে তার খানের বসনখানি,
কোন সে বিরল পল্লীর ঘরে নিয়ে গেছে হায় টানি !

বাতাসের পায়ে বাজে না আজিকে ঝল মল মল গান,
মাঠের ধুলায় পাক খেয়ে পড়ে কত যেন হয়ে মান !
সোনার সীতারে হরেছে রাবণ, পল্লীর পথ পরে,
মুঠি মুঠি খানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে !
মাঠে মাঠে কান্দে কলমীর লতা, কান্দে মটরের কুল,
এই একা মাঠে কি করিয়া তারা রাখিবোগো জাতি-কুল।
লাঙল আজিকে হয়েছে পাগল, কঠিন মাটিরে চিরে,
বুকখানি তার নাড়িয়া নাড়িয়া ঢেলারে ভাঙিবে শিরে।

তবু এই গাঁও রহিয়াছে চেয়ে, ওই গাঁওটির পানে,
কত দিন তারা এমনি কাটাবে কেবা তাহা আজ জানে।
মধ্যে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নক্সী-কাঁথার মাঠ;
সারা বুক ভরি কি কথা সে লিখি, নীরবে করিছে পাঠ !
এমন নাম ত শুনিনি মাঠের ? যদি লাগে কারো ধান্দা,
যারে তারে তুমি শুধাইয়া নিও, নাই কোন এর বাধা !

সকলেই জানে, সেই কোন কালে রূপা বলে এক চাষী,
ওই গাঁও এক মেয়ের প্রেমেতে গলায় পড়িল ফাঁসি।
বিয়েও তাদের হয়েছিল ভাই, কিন্তু কপাল-লেখা,
কথাবে কেবা ? দারুণ দুঃখ ভালে একে গেল রেখা।
রূপা এক দিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দূর দেশে,
তারি আশা-পথে চাহিয়া চাহিয়া বউটি মরিল শেষে
মরিবার কালে বলে গিয়েছিল — তাহার নক্সী-কাঁথা,
কবরের গায় মেলে দেয় যেন বিরহিণী তার মাতা।

বহুদিন পরে গায়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে, —
সুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়,
রোগ পাথুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায় !
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কথানা রঙিন শাড়ী,
রাজা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি !

সারা গায় তার জড়িয়ে রয়েছে সেই সে নক্সী-কাঁথা, ---
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা ।

কেহ কেহ নাকি গভীর রাতে দেখেছে মাঠের পরে, ---
মহা-শূন্যেতে উড়াইছে কেবা নক্সী-কাঁথাটি ধরে;
হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশীটি বাজায় করুণ সুরে,
তারি ঢেউ লাগি এ-গাঁও ওগাঁও গহন বাধায় বুঝে ।
সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নক্সী-কাঁথার মাঠ,
ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ পাঠ ।

শেষ

Banglainternet.com